নদীর ওপার

মানস রঞ্জন গুপ্ত

এখন শহরে অনেকগুলি অ্যাপার্টমেন্ট। একটার তিনতলার দক্ষিণমুখো ফ্ল্যাটে থাকি আমরা তিনজন—আমি, আমার স্ত্রী রীতা আর আমাদের ছেলে সুমন। আমি চাকরি করি। রীতা সংসার দেখে। সুমন স্কুলে পড়ে।

শহরের পাশে নদী, খরস্রোতা, নৌকা চলে না, কোন সেতুও নেই। নদীর ওপারে যাওয়া যায় না।

ওপারে গ্রাম। এই গ্রামেই আমার পৈতৃক বাড়ি। আমার বাবা, মা, জ্যেঠু, জেঠিমা, জ্যাঠতুতো দাদা-বউদি সবাই থাকে গ্রামে। ওই গ্রামেই আমি বড় হয়েছি। গ্রাম থেকে শহরে এসেছি। এখন আর গ্রামে যেতে পারি না, তখন নদী পার হওয়া যেত। এখন যায় না।

আমি রোজ অফিসফেরত নদী পারে গিয়ে বসি। নদীর ওপার দেখার চেষ্টা করি। খুব আবছা দেখায় যেন কুয়াশায় ঢাকা। মনে দুঃখ নিয়ে বাড়ি ফিরি। রীতা জানেনা।

—তোমার দেরি হচ্ছে রোজ বাড়ি ফিরতে?

রীতা প্রশ্ন করে মাঝে মাঝে। আমি উত্তর দিই না। বলা ভাল মুখে উত্তর আসে না। রীতা জেরা করে না বোধহ য় মনে মনে কোন একটা উত্তর তৈরি করে নেয় কীভাবে, কে জানে?

একদিন আমি নদীর ধারে গিয়ে দেখলাম রীতা বসে আছে। নদীর দিকে চোখ। রীতা এখানে কেন? কি শুনেছে আমার সম্বন্ধে? সন্দেহ করছে আমায়? রীতার পাশে বসলাম। রীতা হাসল।

—ও তুমি! এই এলে?

—তুমি এখানে কেন? কী দেখছ?

—আমার স্বামীর মন। নদীর ওপারেই রয়ে গেছে!

এরপর দু'জনেই চুপচাপ। শুধু খরস্রোতা নদীর জলে স্রোতের শব্দ।

মস্তিস্ক

পরিতোষ রায়

আমার দেহটিকে সর্বমোট ষোলটি টুকরো করা হল। জাদুকর তার সম্মোহন শক্তি প্রয়োগ করে ষোলটি টুকরোকে বিভিন্ন দামে ভাগ করলেন।

মঞ্চের ওপর একটি লম্বা বেঞ্চ। তার ওপর পর পর শায়িত আমার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। দেহের ষোলোটি টুকরোই তখন পণ্যে পরিণত। জাদুকর কোনটির মূল্য ধার্য করলেন, তিনশো টাকা, কোনটির দুইশো আবার কোনটির সাতশো টাকা। সবচেয়ে কম মূল্যে যেটি ধার্য হল তা আমার মস্তিষ্ক। মাত্র পঞ্চাশ টাকা!

আমি দেখতে পাচ্ছি, প্রতিটি দর্শক একরাশ বিস্ময় নিয়ে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এবং মন্ত্রমুগ্ধের মতো জাদুকরের বক্তব্য শুনছে।

কিছুক্ষণ পর এক ক্রেতা এগিয়ে এলেন, সরকারি জাদুকরকে প্রশ্ন করলেন, মস্তিষ্কটির দাম এত কম কেন?

জাদুকর বললেন, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাল থাকলেও এই ভদ্রলোকের মস্তিষ্কে কিছু নেই?

ঠিক আছে, তাহলে মস্তিষ্কটাই আমাকে দিন।

জাদুকর এবার বিস্মিত হলেন। বললেন, এই শূন্য মস্তিষ্ক নিয়ে আপনি কী করবেন?

সহাস্য মুখে তিনি বললেন, এবার আমি যা খুশি এই মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে নিতে পারব!